ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 898-904
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.304

কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে কৃষি অনুশীলন: বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

মলয় ঘোষ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক-১, সংস্কৃত বিভাগ, বলাগড় বিজয়কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Arthashastra of Kautilya is not only a treatise on Indian political thought and diplomacy but also a significant documentation of advanced agricultural science. This study analyses Kautilya's scientific observations on agriculture during the Maurya period and presents a comparative perspective with modern agricultural practices.

The role of the Sitadhyaksha as the administrative head of agriculture highlights systematic approaches to seed preservation, irrigation management, and diversified farming. Detailed strategies regarding rainfall measurement, seasonal planning, soil-based crop selection, and harvesting techniques reflect a rational and scientific agricultural framework.

Practices such as seed purification and the use of organic fertilizers indicate early principles of sustainable agriculture. In the context of contemporary challenges such as climate change, soil degradation, and food scarcity, Kautilya's agricultural vision remains highly relevant. Above all, he recognised an economic framework similar to the modern-day performance-based incentive system for workers. Thus, the agricultural system described in the Arthashastra may be regarded as a well-structured foundation of modern agricultural science.

Keywords: Kautilya, Arthashastra, Sitadhyaksha, Irrigation Management, Sustainable Agriculture, Mauryan Economy

প্রাচীন ভারতের মূল্যবান জ্ঞানভাণ্ডারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল অর্থশাস্ত্র। এর প্রণেতা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রচিন্তক কৌটিল্য, যিনি মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ও মন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। এই গ্রন্থে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন, পররাষ্ট্রনীতি, কর আদায় এবং সামাজিক কাঠামোর পাশাপাশি আয় উপার্জনের বিভিন্ন উপায়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে কৃষি ছিল মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি। সেই কারণে কৌটিল্য কৃষিকে কেবলমাত্র উৎপাদনমূলক কার্যকলাপ হিসেবে দেখেননি, বরং একে একটি সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র-এর পনেরোটি অধিকরণের মধ্যে দ্বিতীয় অধিকরণের অন্তর্গত চব্বিশতম অধ্যায়ে ভারতীয় কৃষির বিশদ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে কৃষি-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন— কৃষি প্রশাসন, জমির গুণাগুণ নির্ণয়, বীজ নির্বাচন, সেচ ব্যবস্থা, ঋতুভিত্তিক চাষাবাদ, সার প্রয়োগ এবং ফসল সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। উপরিউক্ত নির্দেশনাগুলির বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে কৌটিল্য-এর কৃষি-ভাবনা আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য সংকট, কর্মসংস্থানের অভাব এবং মাটির উর্বরতা হ্রাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রেক্ষাপটে প্রাচীন কৃষিবিজ্ঞান পুনর্মূল্যায়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধে অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত কৃষি বিষয়ক ধারণাগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা হবে এবং আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

সীতাধ্যক্ষ: কৃষিকর্মের প্রশাসক:

কৃষিকাজের ক্ষেত্রে সুদক্ষ প্রশাসকের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এই প্রসঙ্গে অর্থশাস্ত্র-এ উল্লিখিত 'সীতাধ্যক্ষ' প্রাচীন ভারতের কৃষি প্রশাসনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন। তাঁর ওপরই রাষ্ট্রের কৃষি ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিতভাবে পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। 'সীতা' বলতে লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত জমির ওপর উৎপন্ন রেখা বোঝায় এবং 'অধ্যক্ষ' শব্দের অর্থ তত্ত্বাবধায়ক; ফলে সীতাধ্যক্ষ ছিলেন রাজকীয় কৃষিজমির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

তিনি জমির প্রকৃতি নির্ধারণ, উপযুক্ত ফসল নির্বাচন, বীজ সংরক্ষণ, সেচব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। এই সমস্ত কার্যাবলী বর্তমান সময়ের কৃষি আধিকারিক বা কৃষিবিজ্ঞানীদের দায়িত্বের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ বলে আমার মনে হয়।

সীতাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সীতাধ্যক্ষঃ কৃষিতন্ত্র- শুল্ব- বৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞস্তজ্ঞজসখো বা...'।[১] অর্থাৎ সীতাধ্যক্ষকে কৃষিতন্ত্র, শুল্বতন্ত্র এবং বৃক্ষায়ুর্বেদশাস্ত্র জ্ঞান লাভ করে কৃষি কাজের প্রয়োজনীয় বীজ যথা সময়ে সংগ্রহ করবেন। এই জ্ঞান না থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করেও কৃষিকাজ পরিচালনা করতেন। এর থেকে বোঝা যায় কৌটিল্যের সময়ে যোগ্যতাকে দক্ষ প্রশাসক নিয়োগের মাপকাঠি ছিলো। এছাড়া শ্রমিক ও কর্মচারী যেমন দাস ও কর্মকরদের মাধ্যমে চাষাবাদ ও বপনকার্য সম্পন্ন করানোও তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। মনুসংহিতায় দাসের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"ধ্বজাহৃতো ভক্তদাসো গৃহজঃ ক্রীতদত্রিমৌ।
পৈতৃকো দণ্ডদাসশ্চ সপ্তৈতে দাসযোনয়ঃ।।"[২]

আর কর্মকার হল বেতনভুক্ত শ্রমিক। সব দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি ব্যবস্থা কেবল অভিজ্ঞতানির্ভর ছিল না, বরং তা সুসংগঠিত ও বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে আমার মনে হয়। এই ধারণা বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে।

বৃষ্টিপাতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি:

প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান ভারতবাসীদের কাছে কৃষিকাজ শুধুমাত্র কর্মক্ষেত্র হিসেবে নয়, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ হিসেবেও খ্যাত। আবার কৃষিকাজ একটি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত কাজও বটে। একজন কৃষক তার

অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কৃষি কর্ম করে থাকেন। তবে এই কৃষিকাজ করার জন্য আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এই প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে বলেছেন, কৃষি কর্মের সাফল্য অনেকাংশে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। কৃষি কাজের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার পরিচয় পাওয়া যায় ঋকবেদের পর্জন্য সূক্তে। সেখানে বলা হয়েছে-

প্র বাতা বান্তি পতয়ন্তি বিদ্যুত উদোষধীর্জায়ন্তে পিন্বতে স্বঃ।
ইরা বিশ্বেভ্যোভুবনায় জায়তে যৎপর্জন্যঃ পৃথিবীবং রেতসাবতি॥[৩]

অর্থাৎ, বায়ু প্রবাহিত হয়, বিদ্যুৎ চমকায়, ওষধিরা (উদ্ভিদকুল) অঙ্কুরিত হয় এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষিত হয়। যখন পর্জন্য দেব পৃথিবীকে তাঁর বৃষ্টির দ্বারা (বীজশক্তি) সিক্ত করেন, তখন সমস্ত জগতের জন্য অন্ন উৎপন্ন হয়।

এমনকি ইতিহাসবিদ দামোদর ধর্মানন্দ কৌশম্বির মতে, প্রাচীন ভারতীয় কৃষি মূলত মৌসুমী বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল।

অর্থশাস্ত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যেখানে বর্ষার উপর নির্ভর করে কৃষিকাজ করা হতো সেই কৃষিজমিকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা হয়- একটি হলো জাঙ্গল অর্থাৎ মরুপ্রায় দেশ এবং অপরটি হলো অনূপ অর্থাৎ জলপ্রায় প্রদেশ। মরুপ্রায় প্রদেশে যেমন ১৬ দ্রোণ অর্থাৎ ৩২ ইঞ্চি জল জমা হলে তবেই সেই জল শস্য উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত হত। আবার জলপ্রায় প্রদেশে ২৪ দ্রোণ পরিমাণ জল জমা হলে ফলন সম্ভব হতো। এছাড়াও অস্মক ও অবন্তি প্রদেশেও ১৩.৫ ও ২৩ দ্রোণ বৃষ্টি ফলনে সম্ভব পর ছিল। কৌটিল্যের মতে হিমালয় ও পশ্চিমে কোঙ্কন অঞ্চলে সব ঋতুতে জল পাওয়া যেত ফলে সেখানে ফসল উৎপাদনে স্বতন্ত্রতা ছিল।

এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ভিত্তিতে জমির শ্রেণীবিভাজন ও সেই অনুযায়ী চাষাবাদ করা হতো। যেখানে বৃষ্টিপাত কম সেখানে জল সেচের ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি কাজ করতো। এটি আধুনিক কৃষিতে 'বৃষ্টির জল সংরক্ষণ', 'জল ব্যবস্থাপনা' এর ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি পরিকল্পনা পরিবর্তিত হতো। যেমন বর্ষা, হেমন্ত ও গ্রীষ্মকাল ভেদে চাষাবাদের পরিকল্পনা করা হতো এবং অর্থনীতিবিদদের থেকে মতামত অনুসরণ করা হত। কিন্তু আধুনিক যুগে আবহাওয়া দপ্তরের আনুকূল্যে ফসল চাষের ব্যবস্থা অনেক সুবিধাজনক, তবুও প্রাচীনকালে গণনা ও ঋতুভিত্তিক প্রস্তুতি ছিল অনেক বেশি।

তবে এইসব বৈজ্ঞানিক ধারা গুলি সময়ের বিজ্ঞানের সাথে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কৌটিল্য মনে করতেন, বৃষ্টি হল কৃষির মূল ভিত্তি। এই বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করেই তিনি মৌসুমী চাষের কথা বলেছেন। এই ধারণা বর্তমানকালে মৌসুমী চাষাবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন তিনি বলেছেন- শ্রাবণ থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি ভালো হয় বলে ভালো পরিমাণে ফসল সম্ভব হয়। আবার মেঘ যদি একটানা সপ্তাহ ধরে ভারী বর্ষণ করে তাহলে চাষের পক্ষে খুবই কার্যকরী হয়। আবার বর্ষার মাঝে রৌদ্র উঠলে কৃষি কাজের হাসোলো ভালো হয় বলে কৌটিল্য মনে করেন। অতএব বলা যায় কৌটিল্যের বৃষ্টি নির্ভর চাষাবাদের পরিকল্পনা আজও প্রাসঙ্গিক ও স্থায়িত্ব কৃষিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সেচব্যবস্থা ও জলকর:

একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক হল কৃষিকাজ। আর এই কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অর্থ অপরিহার্য। সেই জন্য প্রাচীন কালে কৃষি ব্যবস্থায় জলকর প্রদানের প্রথা ছিল। এই জলকর প্রদানের মাধ্যমে কৃষির সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্ভব হয়েছিল। একটি রাষ্ট্রের রাজা যেহেতু ভূমি ও জল উভয়ের স্বামী, সেহেতু ভূমিকারের মত জলকর রাজাকে দিতে হতো। এ বিষয়ে শ্রীমূলা টীকায় বলা হয়েছে-

"রাজা ভূমেঃ পতি দৃষ্টঃ শাস্ত্রজ্ঞৈরুদকস্য চ।
তাভ্যামন্যত্তু যদ্ দ্রব্যং তত্র স্বাম্যং কুটুম্বিনাম্।।"[৪]

অর্থশাস্ত্রে জলকর ব্যবস্থা ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষকরা নিজেদের দৈহিক পরিশ্রমে বা কলসের দ্বারা জল তুলে নিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতেন, তাহলে উৎপন্ন শস্যের একের পাঁচ ভাগ জলকর দিতে হতো। এছাড়াও যেসমস্ত কৃষকরা খাল নালী কেটে শ্বেত-সুবিধা গ্রহণ করত তাদেরকেও নির্দিষ্ট হারে কর দিতে হতো। এই কর রাষ্ট্রের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল। আধুনিক সময়ে সেচ ব্যবস্থা জন্য বিভিন্ন ধরনের জলকর প্রচলিত আছে। সরকার এই অর্থ নিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাঁধনির্মাণ তথা কৃষিকাজের সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য কাজ করেন, যা প্রাচীন ব্যবস্থার আধুনিক রূপ।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কৃষি পরিকল্পনা:

কৃষিকাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক সময় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অর্থশাস্ত্র-এ কৌটিল্য কৃষিতে বৃষ্টিপাতের গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টির তারতম্যের ফলে কৃষিকাজও ভিন্নভাবে প্রভাবিত হত। কৌটিল্যের মতে, সূর্য ও গ্রহের গতিবিধি এবং প্রাকৃতিক লক্ষণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস করা সম্ভব, যা কৃষি পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত সীতাধ্যক্ষ এই বৃষ্টিপাতের উপর ভিত্তি করে মৃত্তিকা নির্বাচন করতেন এবং উপযুক্ত সময়ে বীজ বপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এর ফলে ভালো ফলন নিশ্চিত করা যেত এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেত। এই কৃষি ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। একজন দক্ষ কৃষি প্রশাসকের জন্য শুধুমাত্র জমি নির্বাচনই নয়, বরং ঋতুচক্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কেও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল, যাতে তিনি যথাযথ সময়ে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে পারেন।

বর্তমান যুগেও এই ধারণার প্রাসঙ্গিকতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানে আবহাওয়া পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ এবং ঋতুভিত্তিক ফসল পরিকল্পনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রাচীনকালে যেমন সূর্য ও গ্রহের অবস্থান দেখে কৃষিকাজের সময় নির্ধারণ করা হত, আজও উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে একই কাজ আরও নির্ভুলভাবে করা হয়।

তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন শস্য, শাকসবজি, ফলমূল ও অন্যান্য উদ্ভিদের চাষ জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা হত। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই সব ধারণার কিছু অংশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও এগুলি মানুষের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ফল। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার সাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গভীর সম্পর্ক ছিল, যা কৃষির সুষ্ঠু বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভূমি বিভাজন ও ফসল নির্বাচন:

কৃষি কাজের জন্য শুধুমাত্র জলসেচ এবং বৃষ্টিপাত অপরিহার্যতা নয়, উপযুক্ত ভূমি ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৌটিল্য মনে করেন সব ধরনের জমি সব চাষের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। তার জন্য ফসল অনুযায়ী ভিন্ন জমি

নির্বাচন করতে হয়। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে- শসা কুমড়ো জাতীয় চাষ নদী বা সরোবরের তীরে, পিপ্পলী আঙ্গুর ও আখের মত ফসলের উপযোগী নদীর অববাহিকায়, শাক ও মূলের জন্য কূপপার্শ্বস্থ জমে ছিল উপযুক্ত স্থান।

এছাড়াও সবজি চাষ ভালো হতো তড়াগের ধারে। সুগন্ধি উদ্ভিদ ও ঔষধি গাছের জন্য আলাদা জমির ব্যবস্থাও ছিল। এর থেকে বোঝা যায় সেই সময় বহুমুখী চাষ পদ্ধতি খুব জনপ্রিয় ছিল। কৌটিল্য এই বহুমুখী চাষের কথার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার জমির প্রকৃতি বিবেচনা করে উপযুক্ত ফসল চাষের দিকনির্দেশ করেছেন। আধুনিক কালে কৃষিবিজ্ঞানে ভূমির প্রকৃতি অনুযায়ী ভূমি বিভাজন ও ফসল নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, যা বর্তমানে 'Land Classification ', 'Soil Management' নামে পরিচিত লাভ করেছে। আধুনিক কৃষি বিজ্ঞানীরা ও কৃষকরা মাটির গঠন ও প্রকৃতি বিবেচনা করে ফসল নির্বাচন করেন, যা কৌটিল্যের চিন্তাধারার এক আধুনিক প্রতিফলন।

বীজসংস্কার ও জৈবসার প্রয়োগ:

কৃষিকাজে দ্বারা উৎপন্ন উন্নতমানের ফসল অনেকাংশে নির্ভর করে উন্নতমানের বীজ প্রস্তুত ও সঠিক জৈব সার প্রয়োগের মাধ্যমে। কৃষি কাজের অন্যান্য ধাপের মতো বীজ সংস্করণ ও বপনের উপযোগী করে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৌটিল্য এই বিষয়ের উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার মতে, বীজ নির্বাচন ও সংস্কার অপরিহার্য। সীতাধ্যক্ষের দায়িত্ব হল বিচ বপন করার আগে সেটিকে নির্বাচন করা, তারপর বীজকে সংরক্ষণ করা, সংরক্ষিত বীজকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করে সঠিকভাবে বপন করা।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলেছেন, বপনের আগে ধান্যবীজকে সাত দিন রাত রোদ ও শিশিরে রাখতে হবে, যাতে ভালো অঙ্কুরোদগম হয়। অনুরূপভাবে মুগ মাষের বীজকে তিন থেকে পাঁচ দিন রাখতে হবে। অতএব কৌটিল্য মনে করেন ভালো অঙ্কুরোদগম উন্নত কৃষি ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্য। আবার এমন কিছু উদ্ভিদ আছে যেমন আমের বীজ লাগানোর পর গর্তে খরকুটো জ্বালাতে হয় এবং ফুল ধারণ করলে গোবর সার দিতে হয়। এর থেকে বোঝা যায় এই ধরনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যা বীজের ফলন বৃদ্ধি করতে অপরিহার্য। এছাড়াও দেখা যায় কার্পাস বীজের স্যারের সাথে সাপের চামড়া পুড়িয়ে ধোঁয়া দিলে কৃষি ক্ষেত্রে সাপের অত্যাচার বন্ধ হয়। এটাও একটি কৌটিল্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। কৌটিল্য এটাও বলেছেন যে,সব ধরনের বীজ বোনার জন্য জলে সোনা ডুবিয়ে তাতে ভিজিয়ে বোনা উচিত।

পরিশেষে আরো বলা হয় যায়, প্রাচীন থেকে বর্তমান কৃষিকাজ একটি পবিত্র ও শুভ কার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রে দেখা যায়, বীজ বপনের পূর্বে নির্দিষ্ট একটি শুভ দিন নির্বাচন করা হতো এবং নির্দিষ্ট আচার অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতি ও প্রচলিত ছিল। সেখানে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

"প্রজাপতয়ে কাশ্যপায় দেবায় চ নমঃ সদা।
সীতা মে ঋধ্যতাং দেবী বীজেষু চ ধনেষু চ।।"[৫]

অর্থাৎ 'প্রজাপতি, কাশ্যপ (সূর্য পুত্র) ও পর্জন্যদেব কে সর্বদা নমস্কার জানাই।'

এইসব দিক থেকে বলা যায়, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা এই ধারণা গুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বীজ বপন, সংরক্ষণ ও রক্ষা করা এইসব রীতিনীতি প্রাচীন পদ্ধতির উন্নত রূপ বলা যায় এছাড়া জৈব সারের প্রয়োগ বর্তমানকালে অনেকাংশেই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে জৈব কৃষি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে। অতএব বলা যায় কৌটিল্যের বীজ ও জৈব সারের প্রয়োগের ধারণা আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

কৃষি ব্যবস্থায় শ্রমিক কল্যাণ ও বেতননীতি:

কথায় আছে শ্রমিক খুশি থাকলে উৎপাদন ভালো হয়- এই নীতি কে সুপরিকল্পিতভাবে রূপ দিয়েছেন প্রায় কয়েক হাজার বছর আগে মহামতি কৌটিল্য। বর্তমান যুগে আমরা যে ন্যূনতম মজুরির কথা বলি, তা কৌটিল্য অনেক আগেই প্রবর্তন করেছিলেন। যাদের শ্রম ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয় সেই শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য তিনি বেতন কাঠামো চালু করেছিলেন। কৌটিল্যে অর্থশাস্ত্রে দেখা যায় সীতাধ্যক্ষ রাখাল, ক্রীতদাস ও অন্যান্য কর্মচারীদের ভোজনসহ প্রতিমাসে ১.২৫ পন করে বেতনের ব্যবস্থা করেছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি দক্ষতা ভিত্তিক বেতনের পক্ষপাতী ছিলেন, তা বর্তমান কর্পোরেট যুগে 'পারফরম্যান্স বেসড ইনসেনটিভ' ব্যবস্থার আদি রূপ। এছাড়াও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের দেব কার্যের জন্য পতিত ফল ও মূল সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছিলেন, যা সামাজিক ন্যায়বোধের অনন্য উদাহরণ। এছাড়াও কৌটিল্য ইচ্ছামতো গাছ থেকে ফুল ও ফল তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না, যেটা তার পরিবেশ সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের দরিদ্র মানুষেরা অনাহারে জীবনযাপন না থাকেন, সেই জন্য তিনি জমিতে পড়ে থাকা অবাঞ্ছিত ধান ও যব সংগ্রহ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মানবিক মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত। একটি রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য হল, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা ও খাদ্য ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। যেটি কৌটিল্য হাজার হাজার বছর আগে ভেবেছিলেন। অতএব বলতেই পারি, আধুনিক সমাজে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও মানববোধ জাগ্রত করতে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এখন ও প্রাসঙ্গিক।

কৃষি: রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান সূচক:

প্রাচীন ভারতের কূটনীতিবিদ ও ও অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য তার বিখ্যাত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থে কৃষিকে একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মেরুদন্ড বলেছেন। তবে কৃষিকে প্রাধান্য দেওয়ার ধারাটি আরো প্রাচীন। ঋকবেদের অক্ষসূক্তে বলা হয়েছে– "অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব।"[৬] অর্থাৎ জুয়া খেলো না, কৃষি কর্ম করো- এই অমোঘ বাণীটি অতীতে ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাধারায় উৎপাদনশীলতার বীজ বপন করেছিল। কৌটিল্য এই বৈদিক উক্তিকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রূপ দেন এবং মনে করেন একটি রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হওয়ার পেছনে একটি অন্যতম মাধ্যম কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন। বর্তমান যুগেও একটি রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষত ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেও কৌটিল্যের এই চিন্তা ধারা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য কৃষিকে এক উৎপাদনশীল কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন কৃষির মাধ্যমে শুধুমাত্র খাদ্য সমস্যা নয়, একটি রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিভিন্ন ঋতুভিত্তিক বিভিন্ন ফসল চাষের মাধ্যমে সারা বছর উৎপাদন ক্রমবর্ধমান। ফলস্বরূপ কৃষকদের স্থায়ী অর্থ উপার্জন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হয়।

এছাড়াও কৃষি একটি রাষ্ট্রের জিডিপি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কারণ কৃষিকাজ এর ফলে উদ্বৃত্ত পণ্য বাজারজাত করে পরোক্ষে মুনাফা অর্জন হয়। একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বৃদ্ধি সম্পর্কে কৌটিল্য সদা সচেতন ছিলেন সে বিষয়ে আমরা তার রচনাতে প্রমাণ পাই। বর্তমানে যে সব গ্রামীন কাঠামো উন্নয়নের কথা বলা হয়, কৌটিল্য কয়েক হাজার বছর আগে তা অনুধাবন করেছিলেন। তিনি পতিত জমিকে চাষযোগ্য করতে এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থার দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত করেন। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। ফলস্বরূপ এটা বলা যায় যে, কৃষি শুধু জীবিকা নয়, বরং রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান সূচক বলা যায়।

উপসংহার:

প্রাচীন ভারতীয় কৃষিচিন্তায় রাষ্ট্রচিন্তক কৌটিল্যের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। কৌটিল্য কৃষিকে একটি উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করেছে তা নয়, বরং সুসংগঠিত প্রাকৃতিক নির্ভর ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছে। তিনি তাঁর সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা জল, মৃত্তিকা, সার, কৃষকশ্রেণী ও জীব বৈচিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক গভীরভাবে উপলব্ধি করে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের ওপর জোর দিয়েছেন।

কৌটিল্যের মতে সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়ন সঠিক প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহারের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। তাই তিনি উন্নত জলসেচ ব্যবস্থা, বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ভিত্তিতে মৌসুমী ফল চাষ, সঠিক জৈবসার ব্যবহার ও বীজ সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্থায়ী কৃষি উন্নয়নে প্রয়োগ করেছেন। আধুনিকযুগে যেখানে কীটনাশক সারের প্রয়োগ, ভূগর্ভস্থ জলের অপচয়, একফসলি কৃষি যা পরিবেশকে ভারসাম্য নষ্ট করছে, সেখানে কৌটিল্যের প্রাকৃতিক ও পরিবেশ বান্ধব কিসের ব্যবহার নতুন ভাবে কৃষিকাজে মুকুটের মতো বিরাজ করেছে। তাই একথা বলা যায়, কৌটিল্যের সময় ভারত ছিল স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ কৃষিভিত্তিক দেশ। তবে পরিশেষে কথা বলতে পারি যে, আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত কৃষি পরিকল্পনা একটি সুস্থায়ী কৃষি উন্নয়নের জীবন্ত দলিল স্বরূপ।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৪১৫।

২.বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। মনুসংহিতা। সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪২৭, পৃষ্ঠা ৮৮৭।

৩. শর্মা, উমা শঙ্কর (ঋষি)। ঋকসূক্তনিকরঃ। চৌখাম্বা পাবলিশার্স, বারানসী,২০১৯, পৃষ্ঠা ১৫৭।

৪. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু। কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা ৪২১।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা ৪২৩।

৬. বন্দোপাধ্যায়, উদয়চন্দ্র। বেদ সংকলন। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা,২০০৬, পৃষ্ঠা ২০৩।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বন্দোপাধ্যায়, মানবেন্দু ।কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্। প্রথম খণ্ড (২০১০), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

২. সিকদার, সুকুমার। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (২০০৮), কলকাতা, অনুষ্টুপ।

৩. বসু, অনিল চন্দ্র। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র (২০০৯), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো।

৪. দত্ত, চৈতালি। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (২০১৭), কলকাতা, ঋদ্ধি প্রকাশ।

৫. Kosambi. D.D, An Introduction to the study of Indian History (1956), Bombay, Popular Book Depot.